দরজায় গিয়ে দাঁড়াতে পারবেন? জীবনানন্দ দাশ সম্বন্ধে আজ সেই কথাই বলা যায়, যে-কথা এই পুস্তকে তাঁর বিষয়ে লিখতে গিয়েই যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সম্বন্ধে বলেছি: তিনি আত্ম-অনুকরণের নিগড়ে আজ বন্দী। আর সমর সেন সম্বন্ধে এখন জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছা হয় যে অত্যন্ত তরুণ বয়সে অত্যন্ত পরিণত মনের পরিচয় দিয়ে তিনি কি যৌবনের পরিপূর্ণ ঋতুতেই নিঃশেষিত হ'য়ে গেলেন? এই গ্রন্থে আলোচিত কবিদের মধ্যে আত্মপ্রকাশের উৎসাহ এখনো অব্যাহত আছে শুধু অমিয় চক্রবর্তী আর বিষ্ণু দে-র। কিন্তু সাম্যবাদে দীক্ষা নেবার পর থেকে বিষ্ণু দে যেন স্বেচ্ছায় পরিহার করেছেন তাঁর সেই নৈপুণ্য, যা ছিলো তাঁর মধ্যে সবচেয়ে প্রশংসনীয়; ওদিকে নিশিকান্ত, শ্রীঅরবিন্দ-আশ্রমের প্রভাবে, তাঁর কবিত্বশক্তিকে অবরুদ্ধ করেছেন পারিভাষিক আধ্যাত্মিকতার গণ্ডির মধ্যে।*

মোটের উপর, সে-উৎসাহ এখন আর নেই, সে-উদ্দীপনা আর নেই। এমন-কোনো নতুন কবি এখনও দেখা দিচ্ছেন না, যাঁর শক্তির স্বকীয়তা স্বয়ংপ্রকাশ। তরুণতরদের মধ্যে অনেকেই নিয়ে আসছেন সরস্বতীর চরণে তাঁদের প্রচেষ্টার উপচার, তাঁদের সদিচ্ছার অঞ্জলি। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁদের উদ্যম নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়, কিন্তু একটা নিরক্ত পাংশুতার ছায়া তাঁরা কিছুতেই যেন এড়াতে পারছেন না। এ-রকম হবার কারণ কি, তা নিয়ে তাঁরা নিজেরাও ভাবছেন, অন্যেরাও ভাবছে। অনেককেই খুব সহজে বলতে শুনি, এর কারণ যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, বিশ্ব-সংকট, ভারতীয় জাতি-জীবনের বর্তমান বৈকল্য। কোনো-কোনো কবির মুখেও শুনেছি এ-কথা। কিন্তু শুধু বাইরের দিকে তাকালেই চলবে কেন, নিজের ভিতরেও তাকাতে হবে। মনের মধ্যে বাণীর আন্দোলন তেমন প্রবল বেগে যদি উপস্থিত হয়, কিছুই কি তাকে থামাতে পারে? কবিতার শক্তির মধ্যে একটি আবশ্যিকতা আছে, সে নিজেই নিজেকে লিখিয়ে নেয়, না-লিখে উপায় থাকে না কবির। কবিতার সেই অনস্বীকার্য প্ররোচনা কবিদের মনে আজ যদি না জাগে, আর তার কারণ যদি যুদ্ধ ব'লে, দুর্ভিক্ষ ব'লে ঘোষণা করা হয়, সেটা এক রকমের আত্ম-প্রতারণা ছাড়া আর কী। কেমন ক'রে বলি যে যুদ্ধ এর কারণ, দুর্ভিক্ষ এর কারণ, যখন মনে-মনে জানি যে যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষ কবিতার প্রেরণার বাধা হ'তে পারে না, এমনকি নিজেরা

* এই মন্তব্যগুলি লেখা হয়েছিলো ১৯৪৫-এ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমাপ্তিকালে, এবং সেই সময়ের পক্ষে এগুলি অসংগত ছিলো না। কিন্তু ইতিমধ্যে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রকাশ করেছেন তাঁর 'সংবর্ত', 'প্রতিধ্বনি' ও 'দশমী', জীবনানন্দ দাশের সর্বশেষ ও চরিত্রবান পর্যায়ের পরিচয় আমরা পেয়েছি, এবং— কোনো-কোনো কবি কবিতাকে ত্যাগ ক'রে থাকলেও— উল্লেখযোগ্য আরো দু-একটি ঘটনা ঘটেনি তাও নয়। আজ, ১৯৫৮-র অন্ত্যকালে, এ-কথা কিছুতেই বলা যাবে না যে আধুনিক বাংলা কবিতা তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি।

— দ্বিতীয় সংস্করণের পাদটীকা

প্রেরণা হ'তে পারে? কিন্তু সংঘবদ্ধ হ'য়ে, প্রতিজ্ঞা ক'রে বা নৈতিক দায়িত্ববোধ থেকে যে প্রেরণা আসে না, আজকের দিনের তরুণ বাঙালি কবিরাই এই কথাটিই যেন ভুলতে বসেছেন। সমকালীন ঘটনার উপর ভাষ্য রচনা ক'রে তাঁরা যেন একটি সামাজিক কর্তব্য পালন করছেন, তার ফল হয়েছে এই যে বর্তমান সাহিত্যের ক্ষেত্রে একজন বিষ্ণু দে বা একজন অন্নদাশঙ্কর কখনো-কখনো সাংবাদিকতাকে অবলম্বন ক'রে কবিতা রচনা করতে পেরেছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কবিতা অধঃপতিত হচ্ছে সাংবাদিকতায়। বহুকে নিয়ে ঘটনা, কিন্তু কবিতা একজনের সৃষ্টি। কবির সেই নির্জন মনোমণ্ডলে কখন কোন ঘটনা ঢেউ তুলবে, বা তুলবেই কিনা, তা কেউ বলতে পারে না। সদিচ্ছা থেকে, কর্তব্যবোধ থেকে সেখানে কিছু হয় না, নিজেকে শুধু প্রস্তুত রাখতে হয়, যাতে মনের সংস্পর্শে আসতে-আসতে বহির্বিশ্বের আলোড়নের পিণ্ড থেকে সেই বৃহৎ দেহময় অংশটা ঝ'রে যায়, যে-অংশ সাময়িক, স্থানীয় ও পরিবর্তমান, থাকে শুধু ভাব, সুর, কম্পন। এই প্রস্তুত হওয়া, এই প্রস্তুত থাকাটাই কবির কাজ। খুবই কঠিন কাজ সন্দেহ নেই, নয়তো কবিত্ব সুদুর্লভ ব'লে কথিত হবে কেন? বস্তুকে (এবং নিজেকে) নিংড়ে-নিংড়ে কয়েক ফোঁটা বিশুদ্ধ নির্যাস বের ক'রে নেয়া— এই শক্তিই কবিত্বশক্তি। বহির্জগতের ঘটনার উপর আমাদের হাত নেই, বস্তু আমাদের প্রজা নয়, কিন্তু আমাদের মন তো আমাদেরই। কথাটা বলা সহজ, কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ মন একটা আদর্শ মাত্র, যে আদর্শে অধিকাংশ মানুষই কখনো পৌঁছতে পারে না, আর যাঁরা পারেন তাঁরাও সেই বৈকুণ্ঠলোকের অধিবাসী নন, অতিথি। সে-আতিথ্যে বার-বার আহূত হবার অধিকার যিনি অর্জন করেন তাঁকেই আমরা কবি ব'লে থাকি। জনতায় যার জন্ম, কবিচিত্তের অখণ্ড নির্জনতায় তার রূপান্তর যদি ঘটে তাহ'লেই তা কবিতার উৎস হ'তে পারে, নয়তো ইতিহাসে তার আসন যত বৃহৎই হোক কাব্যলোকে স্থান হবে না তার। বিশ্ব অনবরত আঘাতের পর আঘাত দিয়ে যাচ্ছে, সেই বিশাল বিশৃঙ্খল বৈচিত্র্যকে কবি তাঁর ব্যক্তিগত বেদনায় উপলব্ধি করেন, আবার সেই ব্যক্তিগতকে ফিরিয়ে দেন সার্বভৌম ক'রে। যে-কথা বিশ্বের, তাকে যতক্ষণ একান্ত তাঁর নিজের কথা ব'লে তিনি অনুভব না করেন, ততক্ষণ তাকে এমনভাবে প্রকাশ করতে পারেন না যাতে তা বিশ্বের ব'লে মনে হয়। বিশ্ব যা বলে ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে তার বিভিন্ন রূপ, কখনো আশাবহ কখনো শোচনীয়, কিন্তু কবির পক্ষে তা সমান মূল্য— যা-কিছু ঘটে, যা-কিছু আছে, সবই তাঁর উপকরণ; এমন-কিছু হ'তে পারে না, যার বস্তুপিণ্ড থেকে আগুন মনের মধ্যে সুর বের ক'রে নিতে তিনি না পারেন। কবি তাই অকলুষেয়, অনাক্রম্যণীয়, বহির্জগতের আঘাত পীড়া দিতে পারে শুধু তাকে, যে-মানুষের মধ্যে কবির বাসা, কিন্তু কবিকে কিছুই করতে পারে না। যদি কখনো মনে হয় যে

কবিতার উৎস আসছে শুকিয়ে, তার জন্য ঘটনার ঘনঘটাকে কেন দায়ী করবো—তার কারণ খুঁজতে হবে নিজেরই মধ্যে। যে-কোনো সময়ে, কবিকে জয়ী হ'তে হবে মানুষের উপর, নয়তো কবিতা সম্ভব হবে না। দেহ ধারণ ক'রে কবিত্বের এই পবিত্রতা সব সময় অক্ষুণ্ণ রাখা দুঃসাধ্য; এ-কথা মেনে নিতে হয় যে স্খলন-পতন ঘটবেই, কিন্তু সেই স্খলন-পতনকে বহির্জগতের দোহাই দিয়ে সমর্থন করবার চেষ্টা যেন আমরা না করি। পারি আর না পারি, আদর্শ উঁচু রাখা চাই, লক্ষ্য রাখা চাই ধ্রুবতে। আদর্শ বড়ো হ'লে স্বল্প শক্তি নিয়েও আমরা কিছু ভালো কাজ হয়তো করতে পারবো, কিন্তু আদর্শকেই যদি বিকৃত হ'তে দিই, তাহ'লে শক্তিমানেরও ব্যর্থতার আশঙ্কা দেখা দেবে। আজকের দিনের বাংলা সাহিত্যে যে-সব বিবেকবান কবিকর্মী 'কেন লিখতে পারছি না', এই প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করছেন খবর-কাগজে বা রাজপথে, তাঁদের আমি বলি যে সে-উত্তর খবর-কাগজে নেই, রাজপথে নেই, বিশ্বব্যাপারের কোনোখানেই নেই, আছে তাঁদেরই অন্তরে। 'Fool! Look into thine heart and write.'